গবেষণা সারমর্ম

সুচনা

মিয়ানমারের রোহিঙ্গা বর্জনমূলক নীতি, এবং বর্জনের ফলে তারা যে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হয়েছে, সে-সব অভিজ্ঞতা এবং সহিংসতা থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে অভিবাসন কিভাবে তাদের মর্যাদাহানী করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই গবেষণায়। এই গবেষণায় 'জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত গোষ্ঠী' হিসাবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মর্যাদার বিষয়টি আদতে কতটা নিশ্চিত করা হয়েছে, তা বিবেচনার পাশাপাশি তারা যে সংকটে আছে তার মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এটি লক্ষ্য করা জরুরি যে বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। তবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের শরণার্থীর মর্যাদা দিয়েছে। এখন নিজেদেরকে তারা প্রায়ই শরণার্থী বলে উল্লেখ করে।

এই প্রতিবেদনটিতে তাদেরকে সাধারণ ভাবে শরণার্থী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যদিও বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাস্তবসম্মত পরিবর্তন করতে পারলে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে। মোদ্দাকথায়, তাদের একটি স্থায়ী আবাস প্রয়োজন যেখানে তাদেরকে পূর্ণ নাগরিকত্ব দেওয়া হবে, এবং মর্যাদা[1], ন্যায়বিচার এবং সমতা বিধান করার সাথে সাথে তাদের এমন ভাবে সহায়তা করা হবে, যেনও তারা দারিদ্র থেকে মুক্তি পায় এবং ইতিবাচক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের নির্মাণ করতে পারে। এ সময়, সাহায্যগ্রহণকারী ব্যক্তিদে (রোহিঙ্গাদের) মর্যাদা রক্ষা ও ভালো থাকার জন্য জরুরী সমস্যাগুলো সনাক্ত করা এবং তাদের সমাধান করা প্রয়োজন। তাই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা মর্যাদা বা মর্যাদাহরণকে কে কীভাবে বোঝে এবং তাদের ভবিষ্যতকে সমর্থন করার জন্য তারা তাদেরকে কিভাবে আহ্বান জানায় তা বুঝে নেয়া অপরিহার্য। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বোঝার জন্য যে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো হলো—

- ২০১৭ সালের আগে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের অভিজ্ঞতার ধরণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- ২০১৭ সালে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর সহিংসতার ধরন: তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার কারণ এবং তাদের স্থানচ্যুতির যাত্রার বর্ননা দেয়া হয়েছে।
- কিভাবে রোহিঙ্গারা তাদের মর্যাদা এবং মর্যাদাহরণ এর ধারণাকে ধারণ করে তা ব্যখ্যা করা হয়েছে।

[1] এই গবেষণা সারমর্মে ডিগনিটি (Dignity) এর সরল বাংলা হিসেবে 'মর্যাদা' কে বিবিচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মর্যাদার সমার্থক শব্দ হিসেবে মান-সম্মানকেও বিবেচনা ও ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপটে 'ইজ্জত' শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েচে মর্যাদাকে বোঝার জন্য। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ রোহিঙ্গা ও আই ডি পি (IDP) দের প্রেক্ষাপটে মর্যাদাকে বোঝার জন্য এই সকল শব্দ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

- রোহিঙ্গাদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সেইসাথে রোহিঙ্গাদের স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য সহায়তামূলক প্রভাব, সেইসাথে ক্যাম্পে তাদের মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি বিস্তারিত তুলে আনা হয়েছে।
- যারা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্য প্রদান করার জন্য কাজ করছেন এবং সরকারি প্রতিনিধিদের মধ্যে মর্যাদার ধারণা এবং তাদের সহায়তা প্রদানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।
- কিভাবে রোহিঙ্গাদের মর্যাদার উন্নয়ন ঘটতে পারে এবং কিভাবে রোহিঙ্গারা আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকটের মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধান খুঁজে পেতে পারে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।
- এবং কিভাবে রোহিঙ্গাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই সমাধান দেয়া শুরু করা যায় সে ব্যাপারে কার্যকরী ও নীতিগত সুপারিশ করা হয়েছে।

রোহিঙ্গাদের কাছে মর্যাদা কি তা এই গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু (অধ্যায় ২ এর সাথে অধ্যায় ৫ এবং ৬)। এই গবেষণা মূলত রোহিঙ্গাদের অতীত যাত্রা (অধ্যায় ২, ৩ এবং ৪), এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা (অধ্যায় ৮), এখন কীভাবে তাদের সমর্থন ও সাহায্য করা যায় (অধ্যায় ৫, ৬ এবং ৭) এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নতির (অধ্যায় ৮) জন্য কি করা যায় তা তাদের বয়ানের মাধ্যমে এই গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় মর্যাদার বিষয়টি শরণার্থী এবং বাস্তুচ্যুতির বিদ্যমান ধারণার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে যেখান থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারব—

১। ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে, দাতাগোষ্ঠী, আইএনজিও এবং সাহায্য গ্রহনকারী ও সরকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মর্যাদা সম্পর্কে একটি গভীর এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করা;

২। সাংস্কৃতিক, ভাষাগত, ভৌগোলিক এবং ধর্মীয় দিক যা রোহিঙ্গাদের মর্যাদা, মূল্যবোধ ও আদর্শ গঠন করেছে— সেসব দিক বিবেচনা করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মর্যাদার ধারণাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। ভিন্ন ভিন্ন দিক বিবেচনা করে পরিস্থিতি, প্রেক্ষাপট এবং শরণার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে (কক্সবাজারের ক্যাম্পে বসবাসকারী নারী-পুরুষ উভয়ের) একটি গভীর বোঝাপড়াকে তুলে ধরা: মাঠকর্মীরা যারা সাহায্য প্রদান এবং শিবিরগুলিতে শরণার্থীদের জীবন উন্নত করার জন্য প্রতিদিন কাজ করে তাদের প্রেক্ষাপট; হোস্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের অভিমত; আন্তর্জাতিক সংস্থার উচ্চ পদস্থ সদস্যদের ধারণা; এবং আশ্রয় প্রদানকারী (হোস্ট) রাষ্ট্রের স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় প্রতিনিধি যারা কৌশলগত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে তাদের মতামত তুলে আনা হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

নবম শতাব্দী থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী উত্তর আরাকানের মায়ো উপদ্বীপে বসবাস করছে, যে এলাকাটি এখন মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য নামে পরিচিত (Shahana, Jahangir and Anisuzzaman, 2019; Ahmed, 2019)। তারা প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান হিসেবে পরিচিত এবং ১৭৮৪ সালে বার্মার বৃহত্তর বৌদ্ধ রাজ্যের কাছে পরাজিত হবার আগ পর্যন্ত তারা উত্তর আরাকান শাসন করেছে (করে

আসছিলো)। ১৮২৬ সালে আরকান বার্মা থেকে বিভক্ত হয়ে যায় এবং যখন ব্রিটেন তার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে, কিন্তু ১৮০০-এর দশকে ব্রিটেন যখন বাকি বার্মাকে উপনিবেশ করে তখন আরাকান বার্মার সাথে পুনরায় যুক্ত হয় (Ahmed, 2000)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন বৌদ্ধরা জাপানিদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলো তখন মুসলিম রোহিঙ্গারা ব্রিটিশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন (Ibrahim, 2016)। ব্রিটিশরা রোহিঙ্গাদের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিলেও, তারা সে প্রতিশ্রুতি রাখেনি। ১৯৪৮ সালে রোহিঙ্গারা তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান, এখন বাংলাদেশ এর সাথে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীনতা লাভ করায়। রাখাইন, যেখানে রোহিঙ্গারা বসবাস করত সেটিকে বার্মার একটি অংশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো, যা এখন মিয়ানমারের অংশ। শুরু থেকেই মধ্য মায়ানমারে বসবাসরত বৌদ্ধ সম্প্রদায় মনে করতো যে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের চেয়ে বাংলাদেশের প্রতি অধিক অনুগত। রোহিঙ্গা ভাষা বাংলাদেশের কক্সবাজার অঞ্চলে প্রচলিত উপভাষার খুব কাছাকাছি হবার কারণে এবং তারা বাংলাদেশীদের মতো দেখতে এবং তারা মায়ানমারে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ থেকে দেখতে আলাদা হবার কারণে এই অনুভূতি আরো প্রকট হয়। এসব কারণে তাদেরকে কখনো মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে ঘোষণাই করা হয়নি। ১৯৬২ সালে মিয়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থানের পরই এই সমস্যা আরো বেড়ে যায়। সে সময় থেকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত অস্বীকার করে আসছে যে, ১৮২৬ সালে ব্রিটিশদের আগমনের আগ পর্যন্ত রাখাইন রাজ্যের সঙ্গে রোহিঙ্গাদের কোনো সম্পর্ক ছিলো। তারা দাবি করে যে, রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের আদি অধিবাসী নয় এবং তাদের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া উচিত (ঐতিহাসিকভাবে এটি এমন নয়)। ১৯৬২ সাল থেকে মিয়ানমারের সামরিক নেতারা রোহিঙ্গাদের রাখাইনে বসবাসের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং তাদের পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে এই ভুল তথ্য প্রচার করে আসছে। দুর্ভাগ্যবশত, মায়ানমারের রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ বৌদ্ধই এখন একে সত্য বলে বিশ্বাস করে (Ibrahim, 2016)। ১৯৬২ সাল থেকে রোহিঙ্গাদের পরিচয়পত্র বহন করতে বাধ্য করা হয় যা তাদের মায়ানমারের নাগরিক হিসাবে চিহ্নিত করে না এবং ১৯৮২ সালে তাদের এই কার্ডগুলি পরিবর্তন করে তাদের 'অবৈধ' অভিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। সেই সময়ে, আইনের মাধ্যমে তাদেরকে সমস্ত নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় যাতে তাদের চলাফেরার স্বাধীনতা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান বিবাহ এবং জন্ম নিবন্ধন, স্বাস্থ্যসেবা, ভোট দেবার অধিকার এবং ধর্ম চর্চার সকল বিষয়ই হুমকীর মুখে পড়ে।

রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্বের অধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতা হারানোর সাথে সাথে তারা ক্রমাগত মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও পুলিশের সহিংসতার শিকার হয়। ১৯৬৬ এবং ১৯৮৮ সালের মধ্যে, সামরিক বাহিনীর অগ্নিসংযোগ, সম্পত্তি ধ্বংস ও দখল, ধর্ষণ; নির্যাতন; রোহিঙ্গাহত্যা সহ অন্যান্য সকল ধরনের সহিংসতার কারণে লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়াসহ প্রতিবেশী দেশগুলিতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় (Ullah, 2016)। ১৯৯১-৯২, ১৯৯২, ২০১২, ২০১৬ এবং সাম্প্রতিক ২০১৭ সালের আগস্ট মাসেও একই ধরনের সহিংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে (Ibrahim, 2016; Wade, 2017; Ullah, 2011)। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় সহিংসতার সাথে, রাখাইনের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর দ্বারা রোহিঙ্গাদের প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। স্বাধীনতার আগে বৌদ্ধ এবং রোহিঙ্গারা পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় পরস্পরের সাথে যুক্তিসঙ্গতভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস

করত। এই শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্যের পরে অস্বস্তিকরভাবে বিদ্যমান থাকলেও তাদের সম্পর্ক এর পরও সমুন্নত রাখার প্রক্রিয়া চলমান ছিলো। ১৯৬২ সালে সে অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে, রোহিঙ্গাদের কাছে হস্তান্তরকৃত কিছু জমি এবং স্থাবর সম্পদ (বিশেষত গবাদি পশু) বৌদ্ধরা দখল করা শুরু করে এবং বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের তাদের থেকে নিচু জাতি হিসাবে দেখা শুরু করে, যার মাধ্যমে ২০১২ থেকে রোহিঙ্গাদের সব কিছু থেকে বিচ্যুত করে রাখার প্রক্রিয়া শুরু হয় ও রাখাইনে বসবাসকারী স্থানীয় বৌদ্ধরা রোহিঙ্গাদের প্রতি ক্রমাগ্রত আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। ১৯৬২ সাল থেকে পুরো সময় জুড়ে রোহিঙ্গারা সহিংসতা, ধর্ষণ, চুরি, সম্পত্তি ধ্বংস, জমি অপসারণ এবং স্থানীয় বৌদ্ধ যারা মগ হিসেবেও পরিচিত, তাদের হাতে নানা রকম তাচ্ছিল্য ও অপমানের শিকার হয়।

২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের উপর চলমান সহিংসতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। অল্প সংখ্যক রোহিঙ্গার বিদ্রোহী কর্মকাণ্ডের ফলে মিয়ানমার বাহিনী ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে ব্যাপকভাবে তাদের দমন পীড়ন শুরু করে। এই সময়ে তারা একটি ক্লিয়ারেন্স অপারেশন পরিচালনা করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেক মানুষকে হত্যা ও ধর্ষণ করে। তারা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে ও সেটি নিশ্চিত করার জন্য তাদের সীমান্ত পর্যন্ত ধাওয়া করে যেন রোহিঙ্গারা তাদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে। রাখাইনে বসবাসকারী স্থানীয় বৌদ্ধদের অনেকেই এই হামলায় যোগ দেয়। এই ঘটনাগুলিকে একটি চলমান গণহত্যা (Journey & Kawli, 2014) বা জাতিগত নির্মূল (Ethnic cleansing) হিসেবে বিবেচনা করা হয় (Bearer and Kamrul Zaman, 2017) ।

গবেষণা পদ্ধতি

রোহিঙ্গাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং গল্পের সকল পরিসর নিশ্চিত করার জন্য, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের (কক্সবাজার ক্যাম্পে পুরুষ ও মহিলা), মানবিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং উর্ধ্বতন পেশাজীবীদের (মানবিক ও রাজনৈতিক) উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হয়েছে। এই গবেষণায় একটি মিশ্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে—

- এ গবেষণায় দুটি জরিপ পরিচালনা করা হয় (একটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে এবং অন্যটি মানবিক সংগঠনের সম্মুখসারিতে কর্মরত কর্মীদের সদস্যদের সাথে)। এর মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে স্থানচ্যুতি সম্পর্কিত বিষয়গুলির পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে করে সহিংসতার অভিজ্ঞতা, মর্যাদা হারানো এবং শিবিরে শরণার্থী হিসেবে বসবাসের অভিজ্ঞতাগুলো বোঝা সহজতর হয়েছে।

- আধা কাঠামোগত/ সেমি-স্ট্রাকচার্ড সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে (রোহিঙ্গা শরণার্থী, সম্মুখসারির কর্মী, পেশাজীবী, নীতিনির্ধারক, এনজিও, আইএনজিও এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে) যা তাদের স্থানচ্যুত হওয়ার কারণ, তাদের বাংলাদেশে যাত্রা, রোহিঙ্গাদের জন্য মর্যাদার অর্থ অনুসন্ধান করা, তাদের মর্যাদাহানী, পরিবর্তন/ অভিযোজন এবং ব্যক্তিক ও দলীয় সহনশীলতা এবং প্রতিটি দল মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানকে দেখার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের জানতে সহায়তা করে।

- ন্যারেটিভ বা গল্প বলার মাধ্যমে অসংগঠিত সাক্ষাৎকার যা রোহিঙ্গা দৃষ্টিকোণ থেকে পুরো বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে।
- বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের (পুরুষ এবং নারী) সাথে দলীয় আলোচনা করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এর উপর ভিত্তি করে পরিচালিত। এছাড়াও, আশ্রয় প্রদানকারী সম্প্রদায়ের (নারী ও পুরুষ উভয়ের) বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি ফোকাস গ্রুপ/ দলীয় আলোচনা করা হয়েছে যার মাধ্যমে তারা প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়ার সময়ে তাদের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রকাশ করে।

- রোহিঙ্গা শরণার্থী অংশগ্রহণকারী এবং মাঠ কর্মী সদস্যদের (মানবিক সংগঠনের সম্মুখসারিতে কাজ করা) ক্যাম্পের মধ্যে নির্দিষ্ট এলাকা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো, যাতে শরণার্থী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া নিশ্চিত হয়। এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে প্রাপ্ত তথ্য রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের একটি বিস্তৃত বিভিন্ন ধরন থেকে নেয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে রোহিঙ্গা শিবিরটি একটি একক ইউনিট বলে মনে হলেও, বিভিন্ন স্থানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, তাই শিবিরের বিভিন্ন অংশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই পার্থক্যগুলি নথিভুক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। উর্ধ্বতন কর্মীদের সাক্ষাৎকারগুলিও উদ্দেশ্যমূলক ছিলো, যেনও তারা পরিস্থিতি এবং নীতি বা কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে যেকোন সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে তাদের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করতে পারে। জরিপ বা সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণের বিষয়ে সম্মত হওয়ার আগে সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের একটি বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছিলো (রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে মৌখিক, অন্যথায় লিখিত) যার মাধ্যমে তারা যেন সম্মতি দিতে সক্ষম হয় (অসম্মতি বা সাক্ষাৎকার দিতে অস্বীকার করতে পারে)।

- রোহিঙ্গা উত্তরদাতাদের ক্ষেত্রে গবেষণার বিষয়ে তাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিলো এবং সেটি তাদের ব্যাখ্যা করা হয়েছিলো, তখন তারা সাক্ষাৎকার দিতে চায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য সময়ও দেওয়া হয়েছিলো যাতে পরবর্তীতে তাদের সম্মতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে সমস্ত তথ্য তাদের নিজস্ব ভাষায় সংগ্রহ করা হয় (যার সাথে বাংলা ভাষার চট্টগ্রামের উপভাষার অনেকটা সাদৃশ্য রয়েছে) যা দোভাষীদের সাহায্যে পরিচালিত হয়েছে। মূল গবেষক বাংলা ভাষায় কথা বলতেন এবং চট্টগ্রামের স্থানীয় কক্সবাজার উপভাষার উপরও তার দখল ছিলো যা রোহিঙ্গাদের ভাষার কাছাকাছি, কিন্তু আমরা রোহিঙ্গাদের পুরোপুরি সম্মান করতে চেয়েছিলাম আর এর জন্য আমরা দোভাষীদের ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বদা তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করি। সম্মুখসারির কর্মীদের এবং নীতি নির্ধারক মানবিক কর্মকর্তা এবং সরকারী প্রতিনিধিদের উপর জরিপ এবং সকল সাক্ষাৎকার ইংরেজিতে পরিচালিত হয়েছিলো। জরিপে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেন বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, তারা কী ধরনের সহায়তা পেতে পারে, তাদের কাছে সাহায্যের মূল্যায়ন এবং এটি কীভাবে বিতরণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে মর্যাদার ধারণা এবং সম্মানজনক এবং একটি

টেকসই ভবিষ্যতের জন্য রোহিঙ্গাদের মর্যাদা ও আশা রক্ষা করা হয়েছিলো কিনা সে বিষয়ে বন্ধ এবং উন্মুক্ত উভয় প্রশ্নই অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আধা-কাঠামোগত/ সেমি-স্ট্রাকচারাল সাক্ষাৎকার এবং দলীয় আলোচনা/ ফোকাস গ্রুপগুলি সহিংসতার গভীর এবং আরও সূক্ষ্ম বোঝাবুঝির সুবিধার্থে পরিচালিত হয়েছিলো। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে মর্যাদার ধারণা এবং কিভাবে রোহিঙ্গা জনগণের মর্যাদাকে সম্মানিত করা হয়েছে বা তারা তাদের মর্যাদাহানী হয়েছে, মোকাবেলা করার কৌশল, মৌলিক পরিষেবা, জরুরি পরিষেবা এবং টেকসই সমাধান বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত সাক্ষাৎকারগুলি সাবধানতার সাথে মূল ভাষায় লেখা হয়েছিলো, রোহিঙ্গা ভাষায় সেগুলি প্রথমে আনুষ্ঠানিক বাংলায় এবং তারপরে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদের পর্যায়ে, স্থানীয় পেশাদার অনুবাদকদের নিয়োগ করা হয়েছে যেখানে কথার মৌখিক এবং অ-মৌখিক উভয় প্রসঙ্গ- ভাষা এবং বক্তৃতার কণ্ঠস্বরসহ- সঠিকভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যাতে অনুবাদটি অর্থের মধ্যে সূক্ষ্মতা ধারণ করে। জরিপগুলি SPSS / এস পি এস এস ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, গুণগত সাক্ষাত্কার, গল্প বলা এবং দলীয় আলোচনা Nvivo/ এনভিভো এর মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গবেষণার প্রধান ফলাফল

মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে, এই গবেষণা তাদের স্থানচ্যুতি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেয়; সহিংসতা, সংঘাত এবং জরুরি অবস্থার প্রতি সম্প্রদায়ের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি এবং টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান তৈরি করে, মধ্যম মেয়াদে স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ জীবনযাত্রার পথ প্রদর্শনের জন্য ব্যবহারিক সমাধান অন্বেষণ করে; দীর্ঘমেয়াদী সমাধানগুলি অন্বেষণ করা এবং সেগুলি সরবরাহ করতে এবং তাদের ভবিষ্যত স্থানচ্যুতি এবং স্থানান্তররোধ করার জন্য কী কী প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো খুঁজে বের করে। এই গবেষণায় বলা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী এবং অর্থপূর্ণ টেকসই উন্নয়ন অবশ্যই রোহিঙ্গাদের প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গভীর বোঝাপড়া তৈরি করবে, তাদের 'ভালো' জীবন ও ভবিষ্যতের ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। তাদের শারীরিক চাহিদা এবং ব্যক্তির নিজস্বতার মূল্যায়নের করে তাদের স্বীকৃতি এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হওয়ার এবং পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জনের সর্বোত্তম সুযোগ রোহিঙ্গাদের রয়েছে। সেই প্রচেষ্টায়, এই গবেষণাটি এখন বাংলাদেশে বসবাসরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের যাপিত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে, যারা বিভিন্নভাবে মর্যাদার ধারনায়ণ করে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে:

- নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা;
- রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে তাদের পরিচিতি ও সকল মৌলিক অধিকার;
- ধর্ম, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের ধর্মের প্রতি নিজস্ব পছন্দ;

- প্রশিক্ষণ এবং পুন: প্রশিক্ষণসহ জ্ঞান ও শিক্ষার (ধর্মীয় শিক্ষা) ভূমিকা
- সম্পদ এবং স্বনির্ভরতা, পুরুষ এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ;
- সংহতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি;
- তাদের মৌলিক চাহিদার প্রতি তাদের প্রবেশাধিকার (যেমন খাদ্য, জল এবং আশ্রয়);
- চলাফেরার স্বাধীনতা

এই গবেষণায় দেখা গেছে যে একটি পরিকল্পিত আক্রমণের ফলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের দেশত্যাগের মাধ্যমে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে এবং তাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং শিক্ষাবিদরা যে সহিংস আক্রমণকে জাতিগত নির্মূলের প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছেন তা ছিলো কমপক্ষে ৫০ বছরের বর্জনমূলক নীতি, বৈষম্য এবং সহিংসতার পরিণতি। রোহিঙ্গা পুরুষ, মহিলা এবং শিশুরা, বাস্তুচ্যুত হওয়ার আগে অথবা চলাকালীন সময়ে মারাত্মক সহিংসতা এবং মর্মান্তিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে, তারা আবার আক্রমণের ভয়ে, কারাগারে বন্দি বা মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ ক্যাম্পে স্থানচ্যুত গোষ্ঠী হিসেবে থাকার ভয়ে, মায়ানমারের রাখাইনে ফিরে যেতে পারছে না। ইতোমধ্যেই চার বছর ধরে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছে, যদিও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তারা আনুষ্ঠানিকভাবে শরণার্থী হিসেবে স্বীকৃত নয়, এবং আগামী বহু বছর ধরে তাদের এভাবে থাকতে হতে পারে বলে আশঙ্কা নিয়ে বসবাস করছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৯১-৯২ তে পালিয়ে আসা কিছু রোহিঙ্গা আর তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে পারেনি এবং এখনও বাংলাদেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছে। মজার বিষয় হল, যখন অনেক রোহিঙ্গা চূড়ান্ত আক্রমণের আগেই তাদের মর্যাদা হারায়, অন্যরা বহিষ্কৃত, বৈষম্য, সহিংসতা এবং দারিদ্র্যের শিকার হবার পরও মৌলিক মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছিলো। মর্যাদার ধারণাকে প্রায়শ:ই একটি জাতিগত বা সামাজিক মর্যাদার একটি উপাদান হিসেবে দেখা হয় (Kateb, 2011)। তাদের চূড়ান্ত নির্বাসনে, প্রায় সকলেই তাদের মর্যাদাহানীর বিষয়টি অনুভব করেছে, তাদের মর্যাদার ধারণার একমাত্র স্থায়ী বৈশিষ্ট্য যা তারা জাতিগত বা সামাজিক সম্মান বলে মনে করে কেবলমাত্র তাই তারা রক্ষা করতে পেরেছিলো যা তারা একে অপরের জন্য বিভিন্ন সময় দেখিয়েছিলো (যেমন ইজ্জত করা, অন্যকে সম্মান করা)।

এই গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের মৌলিক ও দৈনন্দিন চাহিদার জন্য সম্পূর্ণভাবে মানবিক সহায়তার উপর নির্ভর করে এবং তাদের জীবন রক্ষার পাশাপাশি তাদের মর্যাদার জন্য উন্নত আশ্রয় এবং টেকসই আবাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। উপরন্তু, এটাও স্পষ্ট যে, রোহিঙ্গা শরণার্থীরা গত ৪ বছর ধরে শিক্ষার মতো মৌলিক পরিষেবা এবং বিভিন্নরকম খাদ্য সহায়তা পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করছে। মহিলারা তাদের বাড়িতে গোপনীয়তার অভাব বোধ করছে এবং পুরুষদের সাথে ল্যাট্রিন এবং ধোয়া-মোছার সুবিধাগুলির যৌথ ব্যবহারের কারণে মর্যাদাহানির মুখোমুখি হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের জন্য আয়-সৃষ্টির সুযোগ এমনিতেই কম এবং ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কাজের জন্য ছোট ছোট অর্থ প্রদান বন্ধ করে দেয়। তাদের জন্য টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। নারীদের মধ্যে যারা সবেমাত্র ঘরের বাইরে পেশাগত কাজ খুঁজে পেয়েছেন তাদের জন্য এটি বিশেষভাবে কঠিন ছিলো।

তারা এনজিওর জন্য কাজ করেছেন এবং বুঝতে পারছেন যে এই কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা এবং আত্ম-মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, তাদের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য কাজের প্রয়োজনকে কোনভাবেই এই সংকটের যে কোনো মাধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের ক্ষেত্রে যেনও ভুলে না যাওয়া হয়। যদিও রোহিঙ্গারা মিয়ানমার এর সামরিক বাহিনীর আক্রমণ থেকে এখন নিরাপদ এবং ক্যাম্পে বসবাস করে অনেক বেশি নিরাপদ বোধ করছে, এরপরও কিছু মানুষ বিশেষ করে নারী এবং শিশুরা এখনও যৌন সহিংসতা এবং অপহরণের শিকার হচ্ছে এবং জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে বা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের সন্তানদের (মেয়ে ও ছেলেদের) শিক্ষার অভাব এবং তাদের স্বনির্ভর হবার জন্য চাকরির সুযোগের অভাব নিয়েও খুব উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ সরকার এবং মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য অনেক কিছু করছে, তবে মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে এখনো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

সীমিত বাজেট নিয়ে কাজ করা এবং এমন আশঙ্কা রয়েছে যে এই সংকট যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে তবে অর্থ বরাদ্দ আরো হ্রাস পেতে পারে; যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের চিহ্নিত করা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য তাদের ঠিক কী প্রয়োজন তা মূল্যায়ন করা; সাংস্কৃতিক প্রত্যাশা হিসেবে সাহায্য নিশ্চিত করা; শিক্ষাগত ব্যবস্থার অভাব; কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব;

অল্প বা স্বল্পমেয়াদী বিধানের সাথে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনার উপর মনোযোগ দেওয়া (আরও বেশি স্থায়ী বাসস্থান বা নতুন কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা করার মতো মধ্যমেয়াদী সমাধান খোঁজার দিকে একটু মনোযোগ দেওয়া, যাতে রোহিঙ্গারা নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে)। এটি রোহিঙ্গাদের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেয় যা তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে একটি বাঁধা হিসেবে কাজ করে।

সংকটের দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের আলোচনায় মনোযোগের অভাব, মিয়ানমারের পূর্ণ নাগরিক হিসেবে রাখাইনে তাদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে যথাযত মধ্যস্থতার জন্য খুবই সামান্য কাজ করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই গবেষণার মাধ্যমে মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে যেন তারা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে যেখানে তাদের মর্যাদার সাথে ন্যায়বিচার এবং সমতার ভিত্তিতে দেখা হয় এবং সেই জন্য সরকার এবং মানবিক কর্মীরা যেন রোহিঙ্গাদের মর্যাদা রক্ষা করতে পারে এমন কিছু সুপারিশ করা হয়। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনাতেও তাদের জন্য এই ধরনের সহায়তার বিধান রাখা যায়—

- প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা;
- সাহায্য প্রদান করার সময় সবসময় রোহিঙ্গাদের মর্যাদার বিষয়, সংস্কৃতি এবং ধর্মকে বিবেচনা করা;
- শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং মান সম্মত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেন তারা তাদের সম্ভাবনায় পৌঁছানো এবং ভবিষ্যতের সুযোগ থেকে নিজ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে;
- প্রাপ্তবয়স্কদের (পুরুষ এবং মহিলা) কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ/পুনরায় প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা যেন তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ভবিষ্যত নিশ্চিত করা যায়;

- রোহিঙ্গারা তাদের সম্পর্কে এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখার অথবা তাদের উন্নতির জন্য যা যা করনীয় সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সে সব বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা
- যাই হোক, সম্ভবত গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হলো, মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী সমাধান সম্পর্কিত বিষয়াবলী (অধ্যায় ৮ দেখুন)। রোহিঙ্গাদের জন্য তাদের মর্যাদা রক্ষা একটি সত্যিকার দাবী এবং এর সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। এটি বহুমাত্রিক যা তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জীবনযাপনের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। মর্যাদা বিষয়ক আলোচনায়, রোহিঙ্গারা মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর কর্মচারী এবং সরকারী প্রতিনিধিদের সাথে সম্মত হন যে মর্যাদার বিয়য়টিকে আশ্রয়, খাদ্য এবং পানির মতো মৌলিক চাহিদার মত করেই দেখতে হবে এবং একটি অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- রোহিঙ্গাদের মর্যাদা সম্পর্কে আরও সূক্ষ্ম এবং জটিল ধারণা ছিলো (১ নং টেবিল দেখুন) যা প্রায়ই অন্যান্য বিষয়গুলির দিকে ইঙ্গিত করে, বিশেষ করে রাখাইনে তাদের বাড়িঘর থেকে তাদের অব্যাহত বহিষ্কার এবং মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্বের আকাঙ্ক্ষা যা তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে থাকে। এর পাশাপাশি, তারা জরুরি সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে অবহিত বলে কথা বলেছিলো এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই উন্নয়নের অভাবকে এমন একটি দিক হিসাবে দেখেছিলো যা তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

টেবিল ১- মর্যাদার ধারণার তুলনা

রোহিঙ্গাদের মর্যাদার ধারণার উপলব্ধি	মানবিক সহয়াতাকর্মী এবং সরকারী প্রতিনিধিদের রোহিঙ্গাদের প্রতি মর্যাদার ধারণা
নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা	সাংগঠনিক নিয়ম
রোহিঙ্গা এবং মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে তাদের পরিচিতিসহ স্বাধীনতা ও অধিকার;	সম্মান এবং মানবাধিকার
ধর্ম, ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাদের পছন্দের ধর্ম;	প্রয়োজনে জরুরী সাহায্যের ব্যবস্থা
প্রশিক্ষণ এবং পুন:প্রশিক্ষণ সহ জ্ঞান ও শিক্ষার (ইলম/ ধর্মীয় শিক্ষা) ভূমিকা;	
সম্পদ এবং স্বনির্ভরতা, পুরুষ এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ;	
সংহতি,পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি;	
তাদের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা;	
চলাফেরার স্বাধীনতা;	

এই দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যের ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা শরণার্থী, সাহায্য সংস্থা এবং সরকারী উত্তরদাতাদের তথ্যের ভিন্নতা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলো। মানবিক কর্মী এবং সরকারী প্রতিনিধিরা বর্তমানের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার দিকে অধিক মনোযোগী- তাদের মধ্যে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার অভাব প্রকট ছিলো যদিও বাংলাদেশ সরকার তাদের উপকূলের একটি দ্বীপে আরো স্থায়ী বাড়ি নির্মাণ শুরু করেছে (রোহিঙ্গারা যাকে তাদের প্রয়োজনের জন্য অনুপযুক্ত বলে মনে করেছে)। রোহিঙ্গাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি আরো টেকসই লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা ফিরিয়ে আনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তারা স্বল্পমেয়াদী সমাধানের দিকে মনোযোগকে সমস্যাজনক দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে দেখেছিলো। সামগ্রিকভাবে, এই গবেষণায় দেখা গেছে যে—

- স্বল্পমেয়াদী সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করা রোহিঙ্গাদের ভবিষ্যতের জন্য ক্ষতিকর:
- স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা, মিয়ানমারের রাখাইন এলাকায় রোহিঙ্গাদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন এবং তাদের জীবনকে পূনর্গঠন করা থেকে মনোযোগ অন্যদিকে সরিয়ে দেয়।
- স্বল্পমেয়াদী একটি নির্ভরতার সংস্কৃতি বজায় রাখে এবং রোহিঙ্গাদের মর্যাদা হ্রাস করে।
- স্বল্পমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশকে তাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যে অগ্রসর হতেও বাধাগ্রস্ত করছে, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধান না থাকা বাংলাদেশের জন্যও ক্ষতিকর।
- স্বল্পমেয়াদীতা রোহিঙ্গাদের টেকসই ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে বাধা দেয়, যা মিয়ানমারের রাখাইন এলাকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও বাধাগ্রস্ত করছে, যেখানে তারা শেষ পর্যন্ত বসবাসের আশা করে।
- টেকসই উন্নয়ন এর উপদান হিসেবে রোহিঙ্গা জনগণের মর্যাদার জন্য দীর্ঘমেয়াদী শান্তি, চাকরির সুযোগ, উপযুক্ত বাসস্থান এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা তাদের মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য। একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান এর দিকে যাবার জন্য, তারা সবাই স্বীকৃতি দিয়েছে যে শান্তি এবং নিরাপত্তা অপরিহার্য, কিন্তু তারা আরও দশটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সহায়তার আহ্বান জানিয়েছেন—

১	রাখাইনে জমি এবং টেকসই আবাসনের ব্যবস্থা করা
২	রাখাইনে ক্লিনিক নির্মাণ (অথবা বিদ্যমান ক্লিনিকে তাদের সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা), স্কুল তৈরি, সক্ষমতা তৈরির জন্য অবকাঠামো তৈরি করা
৩	ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণ এবং মায়ানমারের রাখাইনে উন্নত জীবন গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় যেমন রাস্তা, কারখানা এবং বিদ্যুৎ কেন্দ্র
৪	রাখাইনে বাড়িঘর, রাস্তাঘাট (যেখানে প্রয়োজন অথবা যেখানে ধ্বংস হয়েছে) এবং জমি পুনরুদ্ধার
৫	কৃষি সহায়তা
৬	সকল শিশুর জন্য শিক্ষা (মেয়ে ও ছেলে)
৭	কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা

৮	ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জন্য মূলধন (খামার, দোকান এবং অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগে)
৯	দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ (এতিহ্যবাহী বা নতুন কর্মসংস্থানের জন্য)
১০	রাখাইনে শান্তি স্থাপন এবং নিরাপদ পরিবেশের ব্যবস্থা

রোহিঙ্গা শরণার্থীরা পরিষ্কারভাবে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী তুলে ধরেন—

- দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন অবশ্যই রোহিঙ্গাদের একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করবে।
- অব্যাহত স্থানচ্যুতি মিয়ানমারের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিণতি এবং এটি বন্ধ করতে হবে। সব পক্ষকে মিয়ানমারের সৃষ্ট সংকটের একটি স্থায়ী সমাধানের দিকে কাজ করতে হবে।
- স্বল্পমেয়াদী সমাধানগুলি যেমন পরিস্থিতির সমাধান করে না তেমনি সঠিকভাবে রোহিঙ্গা জনগণের মর্যাদা পুনরুদ্ধারও করে না।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মর্যাদা এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তি উভয়ের জন্যেই টেকসই উন্নয়ন অপরিহার্য।

গবেষণা প্রতিবেদনের অধ্যায় পরিকল্পনা

অধ্যায় ১ - ভূমিকা: গবেষণার প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি- এই অধ্যায়ে প্রথমে মিয়ানমারে বসবাসকারী রোহিঙ্গাদের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটসহ গবেষণা প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে, এই অধ্যায় মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগণের স্থানচ্যুত হওয়ার পটভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে। অবশেষে, আমরা বর্তমান অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করি, যার মধ্যে গবেষণার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, এবং অংশগ্রহণকারীদের জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ এবং বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অধ্যায় ২- সাহিত্য পর্যালোচনা: রোহিঙ্গাদের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মর্যাদার ধারণায়ন এবং রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির মধ্যেকার নানাবিধ সম্পর্ক- এই অধ্যায়ে আমরা মর্যাদার ধারণার উপর একটি সাহিত্য পর্যালোচনা উপস্থাপন করি এবং রোহিঙ্গাদের মর্যাদা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যেকার সম্পর্ক তুলে ধরি। এর সাথে এসডিজিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে আসা যা এই গবেষণার অন্তর্গত।

অধ্যায় ৩ - নিপীড়ন ও বৈষম্যের নিদর্শন: ২০১৭ সালের আগে মিয়ানমারে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের অভিজ্ঞতা- অধ্যায় ৩ সহিংসতার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে ২০১৭ সালের ক্লিয়ারেন্স অপারেশন শুরুর আগে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের দ্বারা নিপীড়নের ধরণ বর্ণনা করে।

অধ্যায় ৪ - জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত হওয়া এবং রোহিঙ্গাদের মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে যাত্রা। ৪র্থ অধ্যাযয়ে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত হওয়ার কারণ এবং রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে জোড়পূর্বক ভ্রমণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হয়। মিয়ানমারে ২০১৭ সালের নিপীড়নের সময় বেঁচে থাকা অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের উপর পরিচালিত চরম সহিংসতা এবং নৃশংসতার বিষয়ে বিশদ বিবরণ এই অধ্যায়ে রয়েছে।

অধ্যায় ৫ - রোহিঙ্গাদের মর্যাদা এবং মর্যাদার ক্ষতি সম্পর্কে ধারণা- ৫ম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়েছি,

কিভাবে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা তাদের মর্যাদার ধারণা দেয়। রোহিঙ্গাদের সহিংসতার অভিজ্ঞতা কীভাবে তাদের মর্যাদার ধারণাকে প্রভাবিত করে এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে তাদের অনুভূতিগুলিকে প্রভাবিত করে তা চিত্রিত করে।

অধ্যায় ৬- রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মর্যাদার ওপর মানবিক সহায়তার প্রভাব- রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশের শিবিরে মর্যাদাকে কীভাবে দেখছে, তাদের বর্তমান জীবনযাত্রা কেমন তা ৬নং অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে।

অধ্যায় ৭- মানবিক সহায়তাকর্মীদের বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা- অধ্যায় ৭ মানবিক সহায়তাকর্মী এবং সরকারী প্রতিনিধিদের দৃষ্টিকোণ থেকে রোহিঙ্গারা মর্যাদাকে কিভাবে দেখে সি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

অধ্যায় ৮- রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধান- বাংলাদেশে 'শরণার্থী শিবির এর উপস্থিতির কারণে উত্থাপিত কিছু প্রধান বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়-৮ শুরু হয়। এই অধ্যায় মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জরুরী প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে এবং সংকটের প্রথম স্থায়ী সমাধান এবং তারপর উত্তরদাতাদের, মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবিত কিছু মধ্যমেয়াদী সমাধান বিবেচনা করার দিকে অগ্রসর হয়।

অধ্যায় ৯- উপসংহার এবং সুপারিশ- এই অধ্যায় এ গবেষণার উদ্দেশ্য পুনরাবৃত্তি করে, মূল গবেষণার ফলাফলগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধ'রে পলিসি ও চর্চার জন্য সুপারিশ প্রদান করে।